৪. হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (১৮৭৮-১৯৬১):

মহান আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর বংশজ, জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের শিষ্য এবং গঙ্গাধর বিদ্যালংকারের সুযোগ্য পুত্র মহামোহপাধ্যায় হরিদাস ভট্টাচার্য সিদ্ধান্তবাগীশ বিংশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন। তিনি ১৫ বছর বয়সে ‘কংসবধ’ নাটক এবং ১৮ বছর বয়সে ‘জানকীবিক্রম’ নাটক লিখেছিলেন। সংস্কৃতে অসাধারণ পান্ডিত্যের জন্য ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ (১৯৩১), ‘পদ্মভূষণ’ (১৯৬১), ‘ভারতচার্য’, ‘মহাকবি’, মহোপদেশক’, ‘মহামহোপাধ্যায়’, ‘পুরাণশ্রী’, ‘সাংখ্যরত্ন’, সিদ্ধান্তবাগীশ’ প্রভৃতি উপাধি পান।

রচনা

হরিদাস ভট্টাচার্যের অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

[ক] **মহাকাব্য—** রুক্মিণীহরণম্ (১৯৪৩);
[খ] **কাব্য—** শঙ্করসম্ভবম্;
[গ] **খন্ডকাব্য—** বিয়োগবৈভবম্, বিদ্যাবিত্তবিবাদঃ;
[ঘ] **উপন্যাস—** সরলা (১৯৫৩);
[ঙ] **কাব্যশাস্ত্র—** কাব্যকৌমুদী (১৯৪২), স্মৃতিচিন্তামণিঃ বৈদিক বিবাদমীমাংসা সাহিত্যদর্পণঃ (১৯৫১, ৫ম সংস্করণ);
[চ] **অনুদিত গ্রন্থ—** মহাভারত (১৫৯ খন্ডে টীকা সহ বাংলা);
[ছ] **টীকা—** প্রায় ২০টি কাব্যের টীকা রচনা;

[জ] **নাটক—** 'বিরাজ সরোজিনী' (১৮৯৯), বঙ্গীয় প্রতাপম্ (১৯৮৮), 'মিবার প্রতাপম্' (১৯৪৪), 'শিবাজী চরিতম্' (১৯৪৫)। মহানাটকম্, কংসবধম্, জানকীবিক্রমম্;

[জ] **অনুবাদ সহ টীকা—** উত্তর রামচরিতম্, মালবিকাগ্নিমিত্রম্, মালতীমাধবম্, দশকুমারচরিতম্, শিশুপালবধম্, নৈষধচরিতম্, মুদ্রারাক্ষসম্, বিক্রমোর্বশীয়ম্, মহাবীরচরিতম্ এছাড়া আছে বিধবার অনুকল্প।

বিরাজ সরোজিনী (১৮৯৯)

শৃঙ্গার রসপ্রধান নাটিকা ১৮৯৯ সালে হরিশচন্দ্র চতুষ্পাঠী থেকে প্রকাশিত হয়। নাটিকার প্রথমে আছে ন'টি নৃত্য এবং গীত। প্রথম অঙ্গে নায়িকা এবং তার সখীদের দ্বারা শৃঙ্গার রসের সঙ্গীত গাওয়া হয়। এখানে ভীল সৈনিকদের গানের মাধ্যমে পরবর্তী ঘটনার সূচনা করা হয়েছে। এই গীতে মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি, নিষ্ঠা এবং তার রক্ষার কথা বলা হয়েছে। এতে বীর রসে নিষ্পত্তির সহায়তা করা হয়েছে। এই নাটিকার মাধ্যমে নাট্যকার হরিদাস মহাশয়ের বীর সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসার ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বঙ্গীয় প্রতাপম্ (১৯১৮)

এই নাটকেও সঙ্গীতের দ্বারা নাটকের ভাব প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথমাঙ্কে শঙ্কর নামক ব্যক্তির দ্বারা যবনদের অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়াঙ্কে শ্রীনিবাস নামক বৈষ্ণব সাধুর সঙ্গীতের দ্বারা মানুষের জীবনের অনিত্যতা এবং আধ্যাত্মিক সাধনার কথা বলা হয়েছে। তৃতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভকের প্রারম্ভে ধীবরদের প্রাকৃত ভাষায় সঙ্গীতের মাধ্যমে নাটকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। পঞ্চমাঙ্কে নাচ ও গানের মাধ্যমে বিজয়োল্লাস প্রকাশ পেয়েছে। এই অঙ্কে নবীন কন্যাদের গানের দ্বারা পরবর্তী ঘটনার ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মিবার প্রতাপম্

এটি ছয় অঙ্কের এক ঐতিহাসিক নাটক। নাটকের নায়ক মেবারের রাজপুত রাণা প্রতাপ সিংহের বীরত্ব এবং দেশপ্রেমের কাহিনি- এই নাটকের মূল বিষয়। এই নাটকের প্রথমাঙ্কে রাণা প্রতাপের ভীষণ প্রতিজ্ঞা-মান সিংহের অপমানের প্রতিকার,

> **যদ্যমুষ্য প্রতীকারং ন কুর্য্যাং বীর্য্যবানপি। তদাম্বরং ন যাস্যামি যাস্যাম্বরতাং পুনঃ।**

দ্বিতায়াঙ্কে পৃথ্বীরাজ পত্নী সুন্দরী কমলার বুদ্ধিতে আত্মরক্ষা। তৃতীয়াঙ্কে মান সিংহ ও সেলিমের মেবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা। চতুর্থাঙ্কে হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রতাপের পরাজয়। পঞ্চমাঙ্কে প্রতাপের বেঁচে থাকার লড়াই। ষষ্ঠাঙ্কে রাঠোর বীর পৃথ্বীরাজের দ্ব্যর্থবোধক চিঠিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি দেবীদুর্গ জয় করেন। গুরুর আশীর্বাদ ও সুন্দর ভরতবাক্যের মাধ্যমে এই নাটকের সমাপ্তি ঘটে।

শিবাজীচরিতম্

দশ অঙ্কের ঐতিহাসিক নাটকের নায়ক শিবাজী, যিনি স্বতন্ত্রতা প্রাপ্তির জন্য নিজের জীবন সমর্পণ করেছিলেন। এই নাটকে শিবাজীর উৎসাহ, দৃঢ় সংকল্প, ভয়হীনতা, দুর্ধর্ষ বীরত্ব অঙ্কিত হয়েছে । এর প্রথমাঙ্কে নায়কের সাথীদের দ্বারা গাওয়া বাল সঙ্গীতে দেশভক্তির পরিচয় মেলে। দ্বিতীয়াঙ্কে তোরণ দুর্গ বিজয়ের জন্য শিবাজীর সাধুবেশ ধারণ, সৈনিকদের নর্তকীয় বেশ ধারণ, শিবাজীর বংশীবাদন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই নাটকে নৃত্য এবং সঙ্গীত শত্রুদের ধরতে সাহায্য করেছে। দশমাঙ্কে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক, গুরু স্বামী রামদাসের আশীর্বাদ নিয়ে প্রজাদের ছাতার মতো রক্ষায় ব্রতী হন।

বিয়োগবৈভবম্ (খণ্ডকাব্য)

১৩৫৪ বঙ্গাব্দে ২টি সর্গ বিশিষ্ট এই খণ্ডকাব্য প্রকাশিত হয়। নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদক্লিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে কবি এই খণ্ডকাব্য রচনা করেন। প্রথম সর্গের নাম 'যামিনীবৈভবম্'। দ্বিতীয় সর্গের কোনো নাম কবি দেননি। প্রথম সর্গে ৬২ সংখ্যক শ্লোক আর দ্বিতীয় সর্গে ৬৩ সংখ্যক শ্লোক আছে। কামদেব বিচ্ছেদজনিত যন্ত্রণা এখানে বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের প্রথম দক্ষযজ্ঞের সতীর দেহত্যাগজনিত বিরহে শিবের তাণ্ডবনৃত্যের স্তুতি করা হয়েছে—

পরমপুরুষরূপোঽপ্যর্ধনারীশরীরী
রহয়তু বিরহোঽসৌদুঃসহো বশ্চিরায় (১/১)

প্রথম সর্গের মদনের যৌবনবিলাস সুন্দরভাবে বর্ণিত। কবি প্রথম সর্গে মালিনী এবং শেষ শ্লোকে মন্দাক্রান্তা ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর বর্ণনায় কালিদাসের প্রভাব লক্ষ করা যায়। দম্পতির শারীরিক মুখ-ঐশ্বর্য অতিশয়োক্তি, শ্লেষ প্রভৃতি অলংকারে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

রুক্মিণীহরণম্ (মহাকাব্য)

রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর মতে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বিরচিত মহাকাব্য 'রুক্মিণীহরণম্' মহাকাব্যটি ১৯৪৩ খ্রি. হরিদাসের পুত্র হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। আর এই মহাকাব্য রচনার জন্য ঢাকা সারস্বত সমাজ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশকে ১৩৪১ সনে তাঁকে 'শ্যামাসুন্দরী গবেষণা পুরস্কারে' সম্মানিত করেন। এই মহাকাব্যটি ১৬টি সর্গে বিভক্ত, এর প্রধান রস 'বীর'। মহাভারতের বনপর্বের কৃষ্ণকর্তৃক বিদর্ভরাজকন্যা রুক্মিণীর অপহরণের কাহিনিকে আশ্রয় করে রচিত। মহাভারত ছাড়াও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও এই কাহিনি আছে। ১৬টি সর্গ বিশিষ্ট এই মহাকাব্যের—

প্রথম সর্গে— রুক্মিণীর জন্মবৃত্তান্ত, **দ্বিতীয় সর্গে—** রাজপুত্র-কন্যাদের বিদ্যাভ্যাস, **তৃতীয় সর্গে—** রুক্মিণীর ভাই-এর রাজ্যাভিষেক, **চতুর্থ সর্গে—** রুক্মিণীর সঙ্গে

শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়, **পঞ্চম সর্গে**— শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাজকুমারের বিদ্বেষ, **ষষ্ঠ সর্গে**— শ্রীকৃষ্ণকে রুক্মিণীর প্রেমপত্র নিবেদন— *ব্রজিতাস্মি তত্র সসখী পরকঃ পরিতোবৃতা— প্রহরিভিরুদ্যতায়ুধৈঃ।* ...ইত্যাদি। **সপ্তম সর্গে**— কঞ্চুকীর বিদর্ভ থেকে দ্বারকা পর্যন্ত যাত্রাপথের বর্ণনা, অষ্টমসর্গে কৃষ্ণ ও কঞ্চুকীর কথোপকথন, **নবম সর্গে**— কৃষ্ণের রুক্মিণীকে অপহরণের জন্য বিদর্ভযাত্রা, **দশম সর্গে**— কৃষ্ণের সঙ্গে রুক্মিণীর গোপনে দেখা, **একাদশ সর্গে**— সম্ভোগ শৃঙ্গার বর্ণনা, **দ্বাদশ সর্গে**— শিশুপালের আগমে রুক্মিণীর তাকে অভ্যর্থনা, **ত্রয়োদশ সর্গে**— কৃষ্ণের রুক্মিণীকে অপহরণ, **চতুর্দশ সর্গে**— কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা, **পঞ্চদশ সর্গে**— যুদ্ধে কৃষ্ণের জয়লাভ, **ষোড়শ সর্গে**— বসুদেব ও ভীষ্মকের উপস্থিতিতে কৃষ্ণ-রুক্মিণীর বিবাহ।

এই মহাকাব্যে হরিদাস তাঁর বংশের প্রখ্যাত পূর্বপুরুষদের পরিচয় দিয়েছেন। কবি হরিদাস মহাকাব্যের অনেক স্থানে পুরনো ঘটনার পরিবর্তন করে নতুন নতুন অংশ সংযোজন করেছেন কাব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য। তিনি বেশী জোর দিয়েছেন কৃষ্ন-রুক্মিণীর প্রেমকাহিনিতে। এই মহাকাব্যের বিশেষত্ব হল বিস্তৃত প্রেমপত্রের ব্যবহার। মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যানুসারে কবি এখানে সময় হিসেবে— প্রভাত, মধ্যাহ্ন এবং সন্ধ্যার বর্ণনা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে আছে নগর, রাজসভা, যুদ্ধ, সমুদ্রবর্ণনা, নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ-শৃঙ্গার প্রভৃতি রসের কাহিনি, নরপতি ভীষ্মকের নিজের পুত্র রাজকুমার রুক্মিণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে মুনিদের সঙ্গে বসবাস প্রভৃতি। কবি প্রচলিত এবং স্বল্প প্রচলিত ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। এছাড়া, শব্দালংকার এবং অর্থালংকারের প্রয়োগে বিশেষত পনেরো সর্গে এই দুই অলংকারের ব্যবহারে মহাকাব্যটি সমৃদ্ধ হয়েছে।

রচনাশৈলী

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মূলত বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুরে উনশিয়াতে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি জীনকপুর নরেশের টোলের প্রাধ্যাপক ছিলেন। তাঁর নাটকগুলিতে হিন্দুত্বের জাতীয় অভিমান এবং রাষ্ট্রীয় পুনরুত্থানের প্রবল ভাব আছে। তাঁর 'বঙ্গীয় প্রতাপ', 'মিবার প্রতাপ' এর 'প্রতাপ' কথাটি মধ্যে শ্লেষ ব্যবহৃত। একদিকে রাণা প্রতাপ এবং যশোরের প্রতাপাদিত্য, অন্যদিকে মেবার ও বাংলার গৌরব, তেজ বা দেশপ্রেমকে বোঝাচ্ছে। তাঁর তিনটি নাটক নাট্যশাস্ত্রানুসারে লেখা। তিনটি নাটকের ঐতিহাসিক নায়কের আত্মমর্যাদাজ্ঞান আধুনিক সংস্কৃত নাট্যজগতে এক বিশিষ্ট্য মর্যাদা দিয়েছে। তবে 'মিবার প্রতাপ' বেশি জনপ্রিয়। বঙ্গমঞ্চের দিক থেকে হরিদাসের নাটকগুলি বেশি সফল এবং অনেকবার অভিনীত হয়েছে। যুগানুরূপ সরল এবং ওজস্বী গদ্যবিন্যাস তথা ভাষার প্রবাহের কারণে হরিদাস মহাশয়ের রচনাগুলি সুখপাঠ্য হয়েছে। তাঁর 'মিবার প্রতাপ' নাটকে প্রায় ৫০টি চরিত্র আছে। নাটকের কথাবস্তুর বিন্যাস, নাট্যদৃষ্টি খুব সহজ ও

সরল। তাঁর নাটকে দেশপ্রেম প্রধান বিষয় এবং সেই দেশ ভারত, যা হিন্দুস্থান নামে আলোচিত।

হিন্দুস্থানে যবনবসতিনোঁচিতা ভারতেঽস্মিন্
নীহারৌঘস্থিতিরিব শরদ্ব্যোম্নি নক্ষত্রদীপ্তে।

আবার পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে 'সরলা' নামক লঘু উপন্যাস নিয়েছেন হরিদাস। তাঁর মহাকাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'রুক্মিণীহরণম্।' তাঁর উল্লেখযোগ্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ 'কাব্যকৌমুদী'। গ্রন্থটি লক্ষণসূত্রে নিবন্ধ। গ্রন্থটি ১৫টি কলায় বিভক্ত, সবই কাব্যশাস্ত্রীয় তত্ত্বে পূর্ণ। তিনি আবার ২০টি কাব্যের টীকাও লিখেছেন। হরিদাস বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃত সাহিত্যের দিক্‌পাল।

৫. বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য:

বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৮২) আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষত সংস্কৃত নাটকের ক্ষেত্রে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। বেঙ্কট রাঘবনের মতো তিনিও সংস্কৃতের বিভিন্ন শাখায় আধুনিকতার নিদর্শন রেখেছেন। তিনি কোলকাতায় দর্শনশাস্ত্রের প্রাধ্যাপক ছিলেন। সেই সঙ্গে অনেক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন প্রশাসনিক সেবার কাজ করেছেন।

গ্রন্থ রচনা

বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য ইংরেজি, বাংলা এবং সংস্কৃতে বহু গ্রন্থ লিখেন। ইংরেজি ভাষায় কয়েকটি দার্শনিক গ্রন্থ এবং বাংলা ভাষায় দশটি কাব্য সংগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৯৬৭ সাল থেকে সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো—

[ক] **অনূদিত গ্রন্থ**— ওমোরখৈয়ামম্ (অনূদিত গ্রন্থ) ;
[খ] **কলাপিকা** (১৯৬৯ সংস্কৃত সনেট সংগ্রহ) ;
[গ] **নাটক**— কবিকালিদাসম্, গীতগৌরাঙ্গম্ (কাব্যরূপক) (১৯৭৪), শূর্পণখাভিসার (কাব্যরূপক), সিদ্ধান্তচরিতম্, শার্দূলশকটম্ (১৯৬৯), বেষ্টনব্যায়োগঃ (১৯৭১), শরণার্থি সংবাদঃ, মার্জিনাচাতুর্যম্ (আলিবাবা ও চল্লিশ কাহিনী), চার্বাকতান্ডবম্ (চার্বাক মতের সঙ্গে অন্য দর্শনের অনুবাদ), সুপ্রভাস্বয়ংবরম্ (অষ্টবক্র ও সুপ্রভার প্রণয়কথা), মেঘদৌত্যম্ (মেঘদূতের কাহিনি), লক্ষণব্যায়োগঃ (নকশাল আন্দোলন), ঝঞ্ঝাবৃত্তম্ (নাটক), সংস্কৃতিস্রগ্ধরা (স্তোত্রকাব্য ২৫টি শ্লোক, ১৯৮২)

কলাপিকা (সংস্কৃত সনেট সংগ্রহ)

পেট্রার্ক ও শেক্সপীয়রের প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি সনেট বাংলা ভাষায় মধুসুদনের 'চতুর্দশপদী কবিতা'র আদলে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম সনেট রীতির সার্থক প্রয়োগ করেছেন বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য। সনেট ছন্দের সংস্কৃতায়ন করেছেন **সংস্তবক** আর **চতুর্দশপদী**

কবিতা-র সংস্কৃতায়ন করেছেন **কলাপিকা**। দেশীয় ও বৈদেশিক ছন্দ, রাগ-রাগিণী এবং ভারতীয় দর্শনের সমন্বয়ে কবি বীরেন্দ্র সৃষ্টি করেছেন **কলাপিকা** সংস্কৃত সনেট সংগ্রহ। **কলাপিকা** (সংস্তবক পঞ্চাশিকা) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার (কলকাতা) ১৯৬৯ খ্রি.। ওই গ্রন্থে পঞ্চাশটি কবিতা আছে। পঞ্চাশটি সংস্তবক কাব্য হল— **আবির্ভাবঃ, হৃতসর্বস্ব, তনুতীর্থম্** (এই তিনটি কবিতা দিল্লি থেকে প্রকাশিত 'ষোড়শী' আধুনিক কবিতা সংকলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বাকি তিনটি কবিতা হল— 'যুগকবিঃ'। 'মেঘদূতম্' এবং বর্ষাললন্তিকা' মোট ছয়টি কবিতা 'ষোড়শী'-তে জায়গা পেয়েছে)। 'কলাপিকা' গ্রন্থের বাকি কবিতাগুলি হল— 'মুক্তপক্ষঃ', 'প্রেমশক্তিঃ', 'নিরুপমা', 'বাসন্তিকা', 'মৃত্যুঞ্জয়ঃ', 'নির্মোচনম্', 'অসংবাধঃ' 'কল্পলোকঃ', 'স্নেহচ্ছম', 'সঞ্জীবনী', 'কাব্যমোদঃ', 'অনির্বচনীয়া', 'পুষ্পবাণবল্লী', 'প্রেমমায়া', 'দ্বৈতাদ্বৈতম্', 'পুনর্জন্ম', 'জগদ্বৈচিত্র্যম্', 'বিস্মরণম্', 'সত্যপ্রেম', 'আবর্তনম্', 'দুর্দিনম্', স্মৃতিবিলাপঃ', 'সৃষ্টিলীলা', বিত্তশালী', 'মর্মবাণী', 'বিত্তহীনঃ', 'অনুশোকঃ', 'ভ্রষ্টলগ্নম্', 'উন্মাদনা', 'জম্বুদ্বীপম্', 'অমৃতসুতাঃ', 'মৃগতৃষ্ণিকা', 'দুর্ভিক্ষম্', 'চিত্রতারকা', 'চন্দ্রজয়ঃ',' মিথ্যাচারঃ', 'অসংগতিঃ', 'দেশনায়কাঃ', 'জয়পরাজয়ৌ', 'রূপতৃষ্ণা', 'কর্মফলম্', 'মহাপ্রভুঃ', 'রৌরবেশঃ', 'যুগধর্মঃ', 'রাজপুরুষাঃ', পূজাপরিহাসঃ', 'মোহমুক্তিঃ'।

কাব্যবৈশিষ্ট্য

কবি বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য বিরচিত সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে রচিত 'কলাপিকা' (সংস্কৃত সনেট সংগ্রহ) গ্রন্থে শেক্সপীয়রের সনেটের প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা যায়। শুধু 'মাঙ্গলিকী'-তে পেট্রার্ক-এর প্রভাব বেশি ছিল। সনেট (সংস্তবক)-এ রীতিতে এক ছন্দে একটি সম্পূর্ণ কবিতা রচিত হতে পারে। কবিতায় চোদ্দটি চরণ থাকে, প্রথম ও তৃতীয় চরণে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে অন্ত্যানুপ্রাস দেখা যায়। শ্রীভট্টাচার্য তাঁর সংস্কৃত সনেট কবিতায় কবির সুখ-দুঃখ, রাগ-বিদ্বেষ, প্রভৃতির সঙ্গে নতুন ছন্দের ব্যবহার এবং ভারতীয় দর্শনের সার্থক সমন্বয় করেছেন। তিনি এই রীতি প্রয়োগে বলেছেন—

রহসি তরুণা কুর্বতে বিপ্রলীলাঃ।
মুদং যান্তিস্তেনাস্তনুপণধনাঃ ধীবরাঃ।।

কবি বীরেন্দ্রনাথ সংস্তবকে শব্দমাধুর্য, ভাব এবং রসাদির যথোপযুক্ত ব্যবহার করে কবিতায় নান্দনিকা এনেছেন। কবিতাগুলিতে বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রেমের প্রাধান্য বেশি। তাঁর লেখা বাংলা কবিতা 'দেহমন্দিরা'র নতুন ছন্দে সংস্কৃতায়ন ঘটেছে। বীরেন্দ্রের 'কলাপিকা' সনেট কাব্যটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থের 'রৌরবেশঃ' 'চিত্রতারকাঃ', 'পূজাপরিহাসঃ' কবিতায় সমাজের খারাপ দিকগুলি প্রকাশ পেয়েছে। 'যুগধর্মঃ' কবিতায় বর্তমানযুগের চিত্র এঁকে বলেছেন—

হিংস্রৈর্ঘোরান্যৈঃ রণকলমুখরঃ সাধ্যতে ধর্মহেলা।
মিথ্যা জাতা হি ত্রিদিববরসুতাঃ কৃষ্ণসিদ্ধার্থখৃষ্টাঃ।।

দীপক অলংকারে রচিত **দুর্দিনম্** কবিতায় সাম্যের গান শুনতে পাই। কবির সৌন্দর্য ভাবনার প্রকাশ দেখতে পাই, ‘প্রেমমায়া’, ‘পুষ্পবাণবল্লী’ইত্যাদি কবিতায়। এই সনেটকাব্যে কবি যেমন মকরন্দিকা, নারাচ, চিত্রলেখা প্রভৃতি অপ্রসিদ্ধ ছন্দের ব্যবহার করেছেন, তেমনই বীরেন্দ্রকুমার ব্যবহার করেছেন স্বরচিত ছন্দ (সোমলতা-৩৯, জয়ন্তিকা-৩৪, তড়িল্লতা-২৪, মেঘমন্দ্রা-৯ ইত্যাদি)। ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে নতুন কাব্যশৈলী ও ছন্দোবৈচিত্র্যের জন্য কবি বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

নাট্যবিশ্লেষণ

[i] **কবি কালিদাসম্**— বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারে নিবদ্ধ সাত অঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটক প্রথমে ১৯৬৭ খ্রি. সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার থেকে প্রকাশিত হলেও আবার এটি ১৯৬৯ খ্রি. প্রকাশিত হয়। কালিদাসের জীবন নিয়ে এই নাটকটি রচিত হয়েছে। বিক্রমাদিত্যের কন্যা মঞ্জুভাষিণীর সঙ্গে কালিদাসের প্রেম সংঘটিত হয় গোপনে। রাজকন্যা কালিদাসের কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিতা হয়ে প্রেমে আসক্তা হয়। রাজা তা জানতে পেরে কালিদাসকে এক বছরের জন্য রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত করেন। সেখানে থাকাকালীন বন্ধু বররুচির অনুরোধে ‘মেঘদূতম্’ রচনা করেন। পঞ্চমাঙ্কে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর দুজনের রাজা বিবাহ দেন। এই নাটকে প্রস্তাবনা ও ভরতবাক্য আছে কিন্তু নান্দী নেই। এখানে কালিদাসকে একজন প্রথিতযশা কবি হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই নাটকে নাট্যকার কালিদাসের প্রায় পঁচিশ শ্লোক ব্যবহার করেছেন। ভাষার মাধুর্য ও ভাবের গম্ভীরতা নাটকের বৈশিষ্ট্য। নাট্যকার এই নাটকে পুরনো ছন্দের পাশাপাশি অনেক নতুন ছন্দ ব্যবহার করেছেন। নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা গোষ্ঠীর ‘রজতজয়ন্তী’ উৎসবে এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল।

[ii] **শরণার্থি সংবাদ**— ‘সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা’ কলকাতা থেকে ১৯৭২ খ্রি. এই নাটকই প্রকাশিত হয়। নাটকের বিষয়— বঙ্গবিভাগের পর পূর্বপাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সমস্যা। নাট্যকার বীরেন্দ্র নিজে ছিলেন শরণার্থী পুনর্বাসন কেন্দ্রের পশ্চিমবঙ্গের নির্দেশক। তাই শরণার্থীদের দুরবস্থা সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। নাটকটি মূলত শরণার্থীদের কথোপকথনের উপর নির্ভরশীল। দোরথি, আনন্দ, মন্দবী, ফরীদ, আদিশূর প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের শরণার্থিদের করুণ অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে। এই নাটকে পাকিস্তানি জেনারেল ইয়াহিয়া খান, বাংলাদেশের শেখ মুজিবর রহমান, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি প্রমুখের চরিত্রগুলিও অঙ্কিত হয়েছে। নাটকে জানা যায় ইন্দিরা গান্ধি শরণার্থিদের ত্রিপুরা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় প্রভৃতি স্থানে বাসস্থান নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এই নাটকে যেমন— শরণার্থীদের ত্রাস, আশঙ্কা, আনন্দ প্রভৃতি অনুভূত হতে দেখা গেছে তেমনই শত্রুপক্ষের

হিংসা, বিদ্বেষ, অত্যাচারের ছবি প্রকাশ পেয়েছে। এই নাটকের 'ভরতবাক্য' অতি সুন্দর। আদিশূরের কথায় নাট্যকার বলেছেন—

...ক্লেশো ন গণ্যতে ক্লোশো ভবদ্ভিরিতি সুখম্।

শূর্পণখাভিসারম্— এটি একটি কাব্যরূপক বা গীতিনাট্য। পদ্যের আকারে লেখা পাঁচটি দৃশ্যে রাম ও লক্ষ্মণের জন্য লঙ্কারাজ রাবণের ভগিনী শূর্পণখার প্রেম এখানে দেখানো হয়েছে। এই গীতিনাট্যে অনেক সঙ্গীত আছে। শূর্পণখা রামকে প্রণাম করে স্তুতির মাধ্যমে গেয়ে ওঠে—

সৌরবংশদীপং দুর্জনপ্রতীপং শ্রীরামং রম্যতনু ভূপগৌরবম্...।

ইত্যাদি।

[iii] **শ্রীগীতগৌরাঙ্গম্—** বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যের উৎকৃষ্ট গীতিনাটক হল— 'শ্রীগীতগৌরাঙ্গম্'। পঞ্চমাঙ্ক এই গীতিনাট্যে (কাব্যরূপক) ত্রিশটি দৃশ্য, একাশিটি সঙ্গীত, ছয়টি রাগ এবং পঁচাত্তোরটি রাগিণী আছে। কৃষ্ণভক্তির সমাবেশে সাক্ষাৎ অবতার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু চৈতন্যের জীবনলীলা বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া নাট্যকার সহজ ভাষায় সমাজের কুসংস্কার দূর করে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় চৈতন্যকে এঁকেছেন। সেই সঙ্গে তাঁর ভক্তি ও প্রেমভাবনা পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছেন। তাই নাট্যকার নাটকের আরম্ভে বলেছেন—

উদাত্তং ধ্বনিতং কণ্ঠে নববাক্যং মহাত্মনঃ।
চন্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।।

প্রথমাঙ্কে— গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা, বিবাহ এবং সর্পাঘাতে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু ইত্যাদি।

দ্বিতীয়াঙ্কে— বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় বিবাহ, শ্রীবৎসঅদ্বৈত, শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথোপকথন এবং গৌরাঙ্গের ভক্তিমাহাত্ম্য বর্ণন ইত্যাদি।

তৃতীয়াঙ্কে— সন্ন্যাস গ্রহণ, তীর্থপর্যটন, ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলধামে প্রস্থান ইত্যাদি।

চতুর্থাঙ্কে— বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ, গোদাবরী তীরে শ্রীচৈতন্যের রামনিদের সাক্ষাৎকার প্রভৃতি।

পঞ্চমাঙ্কে— ভক্তবৃন্দের দ্বারা চৈতন্য মাহাত্ম্যকীর্তন, হরিদাসের সাক্ষাৎ ও মৃত্যু। কৃষ্ণভাবে ভাবিত চৈতন্যের উন্মাদভাব এবং ভৈরবীরাগে গান ও নৃত্য। এই গীতিনাটকের বিশেষ হল— চৈতন্যের প্রেম ও ভক্তির প্লাবন বর্ণিত। শূদ্র রামানন্দকে চৈতন্য বলেছেন— জাতির কোনো গুরুত্ব নেই। **সর্বাচারান্ পরিত্যজ্য শ্রীকৃষ্ণং শরণং ব্রজ।** ১৯৭৪ খ্রি. নাটকটি প্রকাশিত হয়। এই গীতিনাটকের সব সংবাদ পদ্যে লেখা। এই গীতিনাট্যের প্রথমাঙ্কে নাট্যকার অদ্বৈতাচার্যের মুখ দিয়ে ভৈরবী রাগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সঙ্গীত 'ওই মহামানব আসে' কবিতাটির সংস্কৃতানুবাদে আধ্যাত্মিক সঙ্গীতটি গায়িয়েছেন।

[iv] **সিদ্ধার্থচরিতম্**— বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে একটি হল **সিদ্ধার্থচরিতম্**। আট অঙ্কের এই নাটকে সিদ্ধার্থ (গৌতম বুদ্ধ)-এর জীবনচরিত অঙ্কিত হয়েছে। নান্দীর মতো দীর্ঘ প্রস্তাবনা প্রথমে আছে আর শেষে আছে ভরতবাক্য। প্রস্তাবনার মধ্যে নাট্যকার বলেছেন— সূত্রধারের মুখ দিয়ে পৃথিবীতে এখন ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চলছে। তাই বুদ্ধকে প্রণাম করে নাট্যকার মঙ্গলাচরণে বলেছেন—

জ্ঞানাব্ধিং সৌম্যমূর্তিং নিখিলনরমতং স্তৌমি তং বুদ্ধদেবম্।।

১৯৭০ খ্রি. নাটকটি প্রকাশিত হয়। নাটকটি আরম্ভ হয়েছে—

প্রথমাঙ্কে— দেবদত্তের তীরের আঘাতে আহত হাঁসের সেবা করছেন সিদ্ধান্ত। দেবদত্ত সেই হাঁস নিতে চাইলে সিদ্ধান্ত তা বারণ করে সেই হাঁসকে রক্ষা করে।

দ্বিতীয়াঙ্কে— গৌতমী ও যশোধরার সংবাদ।

তৃতীয়াঙ্কে— মালবিকা, তরলিকা, মন্দারিকা প্রভৃতি সখীদের কথোপকথনে সিদ্ধান্তের পূর্ববৃত্তান্ত, তাঁর স্বভাব এবং গুণগুলি প্রকাশ পেয়েছে।

চতুর্থাঙ্কে— পুত্র সিদ্ধার্থকে সংসারধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য কলাকুশলী মালবিকাদের ব্যবহার।

পঞ্চমাঙ্কে— সারথি ছন্দক ও বৃদ্ধের কথাবার্তায় জানা যায় সিদ্ধার্থ 'বহুজনহিতায় সুখায় চ' প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। সুজাতার ঘরে পায়েস খেয়ে আবার পদব্রজে বেরিয়ে পড়েছেন।

ষষ্ঠাঙ্কের— বিষ্কম্ভকে ছন্দক ও কাশ্যপের বার্তা। এই অঙ্কে পঞ্চদশী, সপ্তদশী প্রভৃতি মায়াকন্যাদের সংলাপ, নৃত্য ও গীত, তবুও সিদ্ধার্থের ধ্যান ভাঙে না।

সপ্তমাঙ্কে— সিদ্ধার্থের 'বোধি' প্রাপ্তির পর শিষ্যদের আর্যসত্যচতুষ্টয়, অষ্টাঙ্গিক, শীলপঞ্চক ইত্যাদি উপদেশ দান।

অষ্টমাঙ্কে— সঞ্জয়, পুষ্কর, দুর্ভাষ, শ্রাবন্তী প্রভৃতি নাগরিকদের কথাবার্তায় গৌতমবুদ্ধের বিশ্ববন্দিতরূপের জ্ঞান, যশোধরা, গৌতমী শুদ্ধোধনদের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ইত্যাদি।

[v] **নাট্যবৈশিষ্ট্য**— এই নাটকটি রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর দ্বারা ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে। নাট্যকারের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়— 'অবদানশতক', 'বুদ্ধচরিত', 'সর্বদর্শনসংগ্রহ', রাধাকৃষ্ণন্-এর ভারতীয় দর্শন, আনন্দকুমার স্বামীর 'বুদ্ধবৌদ্ধধর্মমত' প্রভৃতির প্রভাব এই নাটকে আছে। এই নাটকে বিশ্বমানবতার বাণী, অহিংস বৌদ্ধধর্ম প্রচার করা হয়েছে। আর নাটকের বিশেষত্ব এই যে প্রতি অঙ্কের আলাদা আলাদা নামকরণ করেছেন নাট্যকার, যেমন— 'হংসরক্ষণম্', 'সংবেগোৎপত্তিঃ' প্রভৃতি। নাটকের সমস্ত গুণগুলি রক্ষা করা হয়েছে। নাটকে মাঝে মাঝে পূর্বাচার্যদের সূক্তিগুলি উদ্ধৃত করেছেন নাট্যকার— জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য

পুত্রাঃ —ইত্যাদি। প্রায় ৭০টি নতুন ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর নাটকে পনেরোটি সঙ্গীত ব্যবহার করা হয়েছে। সবদিক দিয়ে নাটকটি উচ্চমানের বলা যায়।

[vi] **বেষ্টন ব্যায়োগ—** এই ব্যায়োগ রূপকে ষাটের দশকে 'ঘেরাও'-এর মাধ্যমে প্রশাসক কর্তৃপক্ষকে কর্মচারীদের দাবী মানতে বাধ্য করার ফলে শ্রমজীবীদের যে ক্ষতি হয়েছিল তার কৌতুককর বা মজার পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। এটি একাঙ্ক এবং প্রহসনও বটে। সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিক ছাড়া আরও আটটি চরিত্র আছে। এতে বেশ কয়েকটি উল্লাসের গান, বাংলার প্রবচনের সংস্কৃতায়ন, সূক্তি উল্লেখযোগ্য। দেশি-বিদেশী শব্দের সংস্কৃতে ব্যবহার— চলদিদং চলিষ্যতি, শিল্পাধ্যক্ষ, প্রকাশ্যহট্ট, কৃষ্ণহট্ট (black market) প্রভৃতি স্মরণীয়।

[vii] **শার্দূলশকটম্—** বীরেন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা পাঁচ অঙ্কের এই প্রকরণে রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার কর্মীদের সমস্যা ও সমাধানের এক বাস্তব চিত্র। এই প্রকরণ এক অভিনব আঙ্গিকে লেখা। তাই ভট্টাচার্য প্রস্তাবনায় বলেছেন—

নবীনৈঃ কাম্যতে নবযুগ কথা নূতনং দৃশ্যকাব্যম্ (১/৩)

এই প্রকরণে নায়ক আদিশূর (সর্বাধ্যক্ষ)। এছাড়া তিন আধিকারিক, বহুশ্রমিক নেতা, ড্রাইভার, চাপরাসী প্রভৃতি পাত্র মানানসই। প্রথমাঙ্কে দুই শ্রমিক সংগঠনের বিরোধ, দ্বিতীয়াঙ্কে সর্বাধ্যক্ষ ও শ্রমিকদের কথাবার্তা, তৃতীয়াঙ্ক দুর্গাপুর ডিপোর শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার, চতুর্থাঙ্কে শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবচিত্র, পঞ্চমাঙ্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও পরিবহন দপ্তরের হস্তক্ষেপে সব সমস্যার সমাধান এতে নাট্যকার-মন্দযানা, নীলকণ্ঠী প্রভৃতি নতুন চল্লিশটি ছন্দের সৃষ্টি করেছেন। প্রকরণে অনেকগুলি সঙ্গীত, আমলাদের ভালো-মন্দ, শ্রমিকদের মদ্যপান প্রবণতা, টেলিফোন পরিষেবার সমস্যা, সমবায় সংস্থার উদ্দেশ্য প্রভৃতির পরিচয় পাই। এই প্রকরণে নাট্যকার কর্তব্যভ্রষ্ট ব্যক্তিদের সঠিক পথে আসার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রকরণটির বৈশিষ্ট্য—

'শার্দূলশকটম্'-কে নাটক না বলে প্রকরণ বলাই ভালো। তার অনেক কারণ আছে। যেমন— নাট্যকার নিজেই এটিকে 'প্রকরণ' বলে স্বীকার করেছেন। সূত্রধারে মুখে তিনি বলিয়েছেন—

অদ্য খলু উপস্থাপ্যতেঽত্র বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যেণ বিরচিতং শার্দূলশকটনামকম্ অভিনবং প্রকরণম্।

ধনঞ্জয়ের 'দশরূপক' এবং বিশ্বনাথের 'সাহিত্য দর্পণ'-এর প্রকরণ-এর উপযুক্ত লক্ষণ অনুসারে 'শার্দূলশকটম্'-এর নায়ক 'আদিশূর' ধীরশান্ত ব্রাহ্মণ যে নিজের কর্তব্য অনুসারে ধর্ম ও অর্থ লাভ করে। তাছাড়া নিজের কর্মচারীদের সুখ-শান্তির

দিকে লক্ষ্য রাখে। বিদূষক নেই। স্ত্রী বর্জিত হলেও চিত্রভানুর অসহায় পত্নীর উল্লেখ আছে। এই প্রকরণের চরিত্রগুলি হল— আদিশূর (সর্বাধ্যক্ষ) বিশ্বনাথ (মুখ্য পরিচালক), নির্মাল্য (চালনাধিকারিক), শ্যামাঙ্গ (মুখ্যশ্রমাধিকারিক), শ্রমিক নেতারা হল— অমিতাভ, ইন্দ্রনীল, রত্নাকর, অমৃত, দিবাকর, নিশাপতি, দায়ুদ, সুরিটা। এছাড়া পরিচালক, শ্রমিকেরা, আজ্ঞাবহ ইত্যাদি। মদের চর্চা আছে। কথাবস্তু তৎকালীন সমাজ, পুঁজিপতি, মিলমালিক, শ্রমিক। শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন আছে। পুলিশের অত্যাচার, শ্রমিকের দুরবস্থা, মদ্যপান প্রভৃতি আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশিত। এই প্রকরণে বীরেন্দ্রবাবু প্রত্যেক অঙ্কে 'প্রবেশক'-এর অভিনব প্রয়োগ করেছেন। এই নাটকের 'রস' করুণের সাথে বীর রস প্রাধান্য পায়। তবে শৃঙ্গার রস নেই। এখানে সংঘ (একতার) বল। অহিংসা মার্গের দ্বারা উদ্দেশ্যের প্রাপ্তি ঘটেছে। শার্দূল (বাঘ)-এর মুখোশ আঁকা পরিবহণ যন্ত্র (বাস)-এর বৃদ্ধি চাওয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে শ্রমিকের। এই প্রকরণের ভারতবাক্যে—

নমামি কলকাতা পরিবহণসংজ্ঞসংস্থাং ...নমামি নৌমিতাম্।।
(৫/১০৭)

কর্মী এবং কর্তৃপক্ষের সমবেতকণ্ঠস্বর শোনা যায়। এর অর্থ রাষ্ট্রিয় পরিবহণ সংস্থা, তাদের কর্মচারীবৃন্দ, তাদের পরিসেবা, শার্দূল (বাঘ) মুখ আঁকা পরিবহণ সেবা (বাস) এবং সহৃদয়দের প্রণাম করে প্রকরণের সমাপ্তি ঘটিয়ে নাট্যকার নতুন কৌশল দেখিয়েছেন। আবার নামকরণও সার্থক। নাট্যকার নিজেই বলেছেন গ্রন্থের আরম্ভে 'নিবেদনে'—

...তস্মৈ সন্তর্প্যতে মে প্রকরণমিদং শার্দূলশকটম্।

বীরেন্দ্রকুমার নিজেই পরিবহণ সংস্থার সর্বাধ্যক্ষ (Chief controller) ছিলেন। এখানে পশ্চিমবঙ্গের বাস, শ্রমিক ও মালিকের মঙ্গল কামনা করা হয়েছে। এই প্রকরণে নাট্যকার প্রচলিত ছন্দ (অনুষ্টুপ, উপেন্দ্রবজ্রা প্রভৃতি) এবং অপ্রচলিত ৪০টি ছন্দ (হংসকেলি, তূর্যনাদ, ত্বরাবতী, রথক্রান্তি প্রভৃতি) ব্যবহার করেছেন। এখানে শ্লোকের প্রাচুর্য বেশি হলেও নাট্যরসের ক্ষতি হয়নি। 'শার্দূলশকটম্' বহুবার মঞ্চস্থ হয়েছে। সঙ্গীতের সুনিপুণ প্রয়োগ, এক বিশেষ রাজনৈতিক ঘরাণার প্রভাব লক্ষ্যণীয়। আলোচনার দ্বারা কঠিন সমস্যার সমাধান, কর্তব্যপথভ্রষ্টকে সঠিক পথে আনা এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার দিশারী বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যকে নমস্কার।